সূরা কোরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কোরায়েশের আসক্তির কারণে, (২) আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যাবলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; (৬) যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে (৭) এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, হে কাফেরকুল, (২) আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ - اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখীর ঝাঁক—কোন বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখী আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখী পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।—(কুরতুবী)

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ — ভেজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সে কংকরকে سِجِّيْلٍ বলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ — عصف -এর অর্থ ভুষি। ভুষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোন জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরাইশদের মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—(কুরতুবী)

সূরা কোরাইশ

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ —আরবী ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حرف لام -এর সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লেখিত لام — এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে انا اهلكنا اصحاب الفيل অর্থাৎ, আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্যে ধ্বংস করেছি, যাতে কোরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোন বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহ্য বাক্য হচ্ছে اعجبوا অর্থাৎ, তোমরা কোরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর, তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে। কেউ কেউ বলেনঃ এই لام -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا -এর সাথে। অর্থাৎ, এই নেয়ামতের ফলশ্রুতিতে কোরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কোরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামনের ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল,

তাই আল্লাহ্ তাআলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ —একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফল মূল পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ - অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, এতে বসবাস-কারীদেরকে ফলমূলের রিযিক দান করুন। আরও বলেছিলেন يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ —অর্থাৎ, বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপরকণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রপিতামহ হাশেম কোরায়েশকে ভিন্‌দেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর্ খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ — নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কোরায়েশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের এবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুনটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ — সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কোরায়েশকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

আবুল হাসান কাযবিনী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্যে সূরা কোরায়েশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (রহঃ) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ্ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন ঃ আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্যা মাযহার জান্ জানান' বিপদাপদের সময় এই সূরা তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সব ধরনের বালামুসিবত দূর করার জন্যে এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ্ (রহঃ) আরও বলেন ঃ আমি বারবার এটা পরীক্ষা করেছি।

সূরা কোরাইশ সমাপ্ত

সূরা মাউন

এ সূরায় কাফের ও মুনাফেকদের কপিয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচারদিবস তথা কেয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এসব কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই ঃ এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকত না দেয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর বশতঃ কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখবাস। সূরায় ويل (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَن صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্যে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَن صَلَاتِهِمْ -এর পরিবর্তে فِي صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ্ হাদীসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ - ماعون শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও ماعون বলা হয়, যা স্বভাবতঃ একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষনীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে ماعون বলে যাকাত বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ এই যে, যাকত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম—অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি জাহান্নাম ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী, কিন্তু ফরয বা ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে ماعون -এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দেবে, ব্যবহার্য জিনিস দেয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই — এতেও তারা কৃপণতা করে।

অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেয়ার কারণেই নয়; বরং ফরয যাকাত না দেয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

সূরা কাওসার

শানে নুযূল ঃ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে ابتر নির্বংশ বলা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। ওদের মধ্যে 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কোন আলোচনা হলে সে বলতঃ আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

সরাকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ —— হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'কাউসার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দান করেছেন। কাউসার জান্নাতের একটি প্রস্রবনের নাম—কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ একথা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের একটি। তাই মুজাহিদ কাউসারের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত।

হাউযে কাউসার ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলব ঃ পরওয়ারদেগার, সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।—(বোখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসায়ী)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ – نحر শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ, জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্যে এখানে نحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ক কাউসার (অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ, তাও অজস্র পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে — নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক এবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবাদত এবং কোরবানী আর্থিক এবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জেহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে— إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ —আলোচ্য আয়াতে وَانْحَرْ — এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (রাহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফের রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাউসার অর্থাৎ, অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)- এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ফজরের সুন্নত নামাযে পাঠ করার জন্যে দু'টি সূরা উত্তম —সূরা কাফিরূন ও এখলাস।—(মাযহারী) তফসীর

ইবনে-কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ফজরের সুন্নতে এবং মাগরিব পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্যে কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) বলেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হোক? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন ঃ কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা— সূরা কাফিরূন, নছর, এখলাস, ফালাক, ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন।—(মাযহারী)

শানে নুযূল ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল ঃ আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে এই শান্তিচুক্তি করি যে, একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন এবং একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব।—(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব এবং একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন।—(মাযহারী)

আবু সালেহ্-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ্ তাআলার অকৃত্রিম এবাদতের আদেশ আছে।

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ — এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হওয়ায় স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বোখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি এক্ষণে কার্যতঃ তোমাদের উপাস্যদের এবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের এবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَ
لَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

سورة النصر مدنية وهي ثلاث آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ
ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾

سورة تبت مكية وهي خمس آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا
كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ
ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

سورة الاخلاص مكية وهي اربع آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সূরা এখলাছ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দিয়েনি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় ما – কে موصول ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مصدرية ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের এবাদত কর, আমি তাদের এবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের এবাদত করি তোমরা তার এবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত এবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত এবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় এবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং এবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের এবাদতপদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের এবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে-কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ — এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ — আরও এক আয়াতে لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ — এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর دين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন যার অর্থ প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাফেরদের সাথে শান্তিচুক্তির বৈধ ও অবৈধ প্রকার ঃ আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا –অর্থাৎ, কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ও ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ আয়াতখানি। কেননা, এটা বাহ্যতঃ জেহাদের আদেশের। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِينُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তিচুক্তি নিষিদ্ধ রয়েছে وَإِن جَنَحُوا۟ আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তিচুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা